Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 26 –35
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প : আখ্যানতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

সুজাতা সরকার
ইমেইল : sujatasarkar2310@gmail.com

Keyword
স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ছোটগল্প, আখ্যানবুনন, বাংলাসাহিত্যে স্বার্থকতা।

Abstract
উপকরণ নয় প্রকরণের বিন্যাসই একটি সাহিত্যের মূল। প্রকরণের বিন্যাসে একজন সাহিত্যিক প্রথম শ্রেণির হয়ে ওঠে। এই বিন্যাসের স্বার্থকতায় সাহিত্যক স্বপ্নময়ের পরিচিতি। তাঁর ছোটগল্পগুলির কাহিনি বিন্যাসের প্রাঞ্জলতা ছোটগল্পের শাখাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে তা অতুলনীয়। এই আলোচনায় সেই প্রাঞ্জল হয়ে ওঠার রহস্যকে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে।

Discussion
সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৯৫১ সালের ২৪শে আগষ্ট উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন। সত্তরের দশকের একজন শক্তিশালী গল্পকার তিনি। সত্তরের দশক মুক্তির দশক, রাজনৈতিক আলোড়নের দশক। নকশাল আন্দোলনকে (১৯৬৭) কেন্দ্র করে আগুন জ্বলে ওঠার দশক। এই সময় সাহিত্যিকেরা দেখেছেন কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন (১৯৬৪), জরুরী অবস্থা (১৯৭৫-৭৭), বাংলা দেশের মুক্তি-যুদ্ধ (১৯৭১) ও অপারেশন বর্গা (১৯৭৬)-র মতো শান্তিশৃঙ্খলার নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। বাংলার গনতন্ত্রের কন্ঠরোধের মতো একের পর এক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছিল তখন তুঙ্গে। সত্তরের দশকের এই 'স্বৈরবৃত্ত দ্রুত ধাবমান পরিবর্তনশীল সময়'[১] স্বপ্নময়ের শিল্পীমনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল বিশেষভাবে। তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন প্রগতিমূলক চিন্তা চেতনা ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বিলীয়মান দশা। প্রভাব পড়ল তাঁর সাহিত্যিক মননে। পুরানো আধারে নতুন আধেয়কে ধারণ করা আর তখন সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি উপলব্ধি করছিলেন আধেয় ও চাহিদার পেষণে ক্রমশ ভেঙে যাওয়া ছোটগল্পের অতিপরিচিত আধারকে নতুন করে গড়ার। সাহিত্যের এই চেনা জগত থেকে বেরিয়ে এসে স্বপ্নময় নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তৈরি করেছিলেন নতুন বাচনভঙ্গি, স্মার্ট গদ্যরীতি। তাঁর 'সেরা ৫০টি গল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সেকথা স্বীকার করে বলছেন—'নানা বিষয় নানা ভাবে লিখতে ইচ্ছা করছে আমার'[২]। বিষয়ের এই নতুনত্ব অন্বেষণ তাঁকে অভিনব আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য আনতে সাহায্য করে। আমরা পাই এবং বাংলা সাহিত্য পায় তাঁর বিষয় বৈচিত্র্যের নানান আঙ্গিক। আখ্যান কাঠামোয় যা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। আমার আলোচ্য তাঁর এই ছোটগল্পের আভিনব আঙ্গিকগুলি। যেখানে সাধারণের কথা তাৎপর্যবাহী হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আমার বিষয় যেহেতু স্বপ্নময়ের আখ্যান তাই আলোচনার শুরুতে আখ্যান বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে নেওয়া জরুরী। সাহিত্য মূলত কথার শিল্প। বিষয়বস্তু একই থাকলেও কথার উপস্থাপনের গুনে একটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন সংরুপে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। আসলে উপকরণের প্রকরণই হল শিল্প বা সাহিত্যির মূল। বর্তমানে শিল্পের হয়ে ওঠার বা শিল্পের রূপায়ণ রহস্যটির ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানের জন্ম হয়েছে, যাকে বলে হয় 'আখ্যানতত্ত্ব' বা 'Narrative Theory'। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো আধুনিক আখ্যানের উদ্ভব ও বিকাশ পশ্চিমে। আখ্যানের গঠন ও রীতিকে তার শিল্পের রূপায়ণ প্রক্রিয়াকে বুঝে নেওয়ার এক তাগিদ তৈরি করে এই আখ্যানতত্ত্ব। অবয়ববাদীরা মনে করেন, আখ্যান মূলত একটি ভাষাতাত্ত্বিক কোড। তাদের মতে অজস্র আখ্যানের মধ্যে থাকে মাত্র সামান্য সংখ্যক কাহিনীসূত্র এবং এই কাহিনীসূত্রের যথাযথ বিন্যাস ও সমবায়েই সৃষ্টি হয় একটি আখ্যান। সুতরাং বলা যায়, প্রকাশস্তরে আখ্যানের এই Code-ই সৃজনস্তরে আখ্যানের message-এ পরিণত হয়। সেকারণেই আখ্যানের শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় আখ্যানের সংগঠনকে মোটামোটি – দুটি স্তরে ভাগ করেছেন বিভিন্ন আখ্যানতাত্ত্বিকগণ। প্রপ, তোমাসোভস্কি প্রমুখ রুশ অবয়ববাদীদের আলোচনায় আখ্যানের দুটি স্তর হল যথাক্রমে Fabula ও Sjuzhet। চ্যাটম্যানের পরিভাষায় যা Story এবং discourse। ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কির দৃষ্টিতে দেখলে এগুলি হল Deep Structure ও Surface Structure। যদিও পরিভাষাগত ঈষৎ ভিন্নতা ছাড়া আখ্যান গঠনের এই স্তর বিভাজন প্রায় একই।

Fabula বা Story স্তরটি হল আখ্যানের প্রথম স্তর। এই স্তরটি মূলত প্রাথমিক কাহিনীসূত্র। লেখকের পরিকল্পনার দ্বারা গঠিত এই প্রাথমিক সূত্রের প্রয়োগ কৌশলগত রূপায়ণ ও উপস্থাপনই হল আখ্যানের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ Sjuzhet বা Discourse। একে আমরা অধিস্তরও বলে থাকি। যেহেতু Story বা Fabula স্তরটি হল আখ্যানের ঘটনা সমূহের স্তর তাই এই স্তরে লেখকের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা অবান্তর। অন্যদিকে Discourse স্তরটি অনিবার্যভাবে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আশ্রয়ী। এই স্তরে একজন লেখক তাঁর নিজস্ব চিহ্নিত স্টাইলে, তাঁর পছন্দ মতো আধারে কোনো কাহিনীসূত্রকে স্থাপন করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গির রহস্যময়তা প্রসঙ্গে বলেছিলেন – 'বিষয়টা দেহ, ভঙ্গিটা জীবন'[৩]। অর্থাৎ Fabula স্তরটি হল দেহ এবং Discourse বা বাচন স্তরটি হল আখ্যানের জীবন স্বরূপ। আখ্যানের এই যে জীবন তার মূল উপাদান কী কী? তাত্ত্বিকগণ Discourse স্তরের ছয়'টি উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই উপাদানগুলি হল -

১. সংস্থান (Setting)
২. নিরীক্ষণ (Focalization)
৩. কাল / সময় (Time)
৪. চরিত্রায়ণ (Characterization)
৫. কথন (Narration)
৬. মুক্ত পরোক্ষ বাচন (Free Indirect Discourse FID)

নিরীক্ষণ যেহেতু আখ্যানের প্রেক্ষিত (অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিত) নির্নায়ক, তাই অধিকাংশ আখ্যানতাত্ত্বিকগণ নিরীক্ষণকে আখ্যান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করতে চান না। আখ্যানতাত্ত্বিকেরা বাচনেরও দুটি ভাগ করে থাকেন – একটি কথন অপরটি মুক্ত পরোক্ষ বাচন। আর এই আখ্যান উপস্থাপন যেই করুক না কেন সেই আখ্যান একটি চরিত্রকে নিয়ে আবর্তিত হবেন। স্বাভাবিকভাবে চরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখানে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আখ্যানটিতে সময়ের যথাযথ ব্যবহার একজন আখ্যানকে স্বার্থক করে তুলতে পারে। তাই 'সময়' নিয়ে সচেতন থাকেন লেখক তার আখ্যান বিন্যাসের সময়। পুরো উপাদানগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ করে তিনি উপন্যাসের সেটিংস বা আবহকে গড়ে নেন। এই আবহই একটি আখ্যানের মূল আকর্ষণ। Discourse স্তরে এই উপাদানগুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ কৌশলের মাধ্যমেই যেমন একটি আখ্যানের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়, তেমনই একজন লেখকের সৃজনকুশলতা প্রকাশ পায়।

এই আখ্যানবুননেই স্বপ্নময়ের কৃতীত্ব। শুধুমাত্র বিষয় নয়, আখ্যান কৌশলের যথার্থ বিন্যাসেই স্বপ্নময়ের স্বার্থকতা। উপরিউক্ত উপাদানের প্রেক্ষিতে স্বপ্নময়ের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্পের আখ্যানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধি স্থানীয় তিনটি নির্বাচিত ছোটগল্প হল 'দীন-ইলাহি' (শারদ–প্রতিক্ষণ, ১৯৯০), 'গিরিবালার গল্প' (শারদীয় নন্দন, ১৯৯৭), 'লজ্জামুঠি' (শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ ২০০৩)।

প্রথমেই আসা যাক স্বপ্নময়ের সময়ের যথাযথ ব্যবহার প্রসঙ্গে। সময় কে তিনি কীভাবে ব্যবহার করেছেন তা দেখে নেওয়া যাক। সমস্ত শিল্পই সময়ের কথা বলে। তাই শিল্পসাহিত্যে সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার একজন লেখককে সার্থক করে তোলে। লেখক তাই আখ্যানের সময় নিয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকেন। আখ্যানের সময় গঠিত হয় দুটি কাল নিয়ে – একটি কাহিনীকাল বা স্টোরিটাইম আর দ্বিতীয়টি সেই কাহিনীকালের সময় বা কথনকাল। স্বপ্নময়ের সাহিত্যে এই দুই কালের ব্যবহারের বৈচিত্র্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। স্বপ্নময়ের 'গিরিবালারগল্প' আখ্যানে সময় এইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেখানে আমরা দেখি—

> "মনে পড়ে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মাস্টারদা আর তারকদার ফাঁসী। সেদিন আকাশে সূর্যদেবের দেখা নাই টিপটিপ বৃষ্টি, বিশ্ব চরাচরও যেন শোকাকুল।"[৪]

এখানে কাহিনীকাল কথনকালের পূর্বের ঘটনা। স্বভাবতাই কথক কাহিনীতলের বাইরের চরিত্র। আবার আমরা আখ্যানে শুনি গিরিবালার আত্মকাহিনী, যেমন—

> "আমার ঘরে আত্মগোপন করে নাই কুঞ্জ। আমিই তারে ডাকছিলাম।আমার লাইগ্যাই সে ধরা পড়েছিল।"[৫]

এখানে কাহিনীকাল অতীতের কিন্তু কথনকাল বর্তমানের এবং কথক কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র। এইভাবে কাহিনীকাল ও কথনকালের সূক্ষ্ম ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে, সময়ের ফ্ল্যাস-ব্যাক পদ্ধতি অবলম্বন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা দেশভাগের ঐতিহাসিক সময়কে দক্ষতার সাথে গল্পে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার। আসলে 'প্রকৃত সময়ের' সাথে ধারনাগত সাদৃশ্য থাকলেও আখ্যানের সময় 'প্রকৃতসময়' থেকে একেবারেই আলাদা, বস্তুত আখ্যানে কাহিনীকাল সর্বদাই অতীতের। তা সেখানে কথক কাহিনীতলে উপস্থিত থাকুক কিংবা না থাকুক। এরূপস সময়চেতনতা স্বপ্নময়ের প্রায় প্রতিটি আখ্যানেই লক্ষ করা যায়।

কাল সচেতন, সমাজ সচেতন স্বপ্নময় তাঁর অধিকাংশ গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন সমস্যামূলক সময়কে তুলে ধরেছেন। এইরূপ এইটি গল্প হল 'লজ্জামুঠি'। 'সর্তকতামূলক রূপকথা' গ্রন্থের ভূমিকাতে স্বপ্নময় বলেছেন—

> "যে প্রক্রিয়া মানুষকে ভূমিদাস করে, সেই প্রক্রিয়ারই প্রলম্বিত ছক মানুষকে যন্ত্রদাস বানায়। যন্ত্রের শাসন দন্ডটিকে আমরা যাদুদন্ড ভেবে দিব্যি সম্মোহনে আছি।"[৬]

বর্তমানের যান্ত্রিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে মানুষ ও যন্ত্রের যে এক অদ্ভুদ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটাই চিত্রিত হয়েছে 'লজ্জামুঠি' গল্পে। বর্তমানে মানুষের চেয়ে মেশিনের উৎকর্ষতাই আমাদের আকর্ষন করে বেশি। আলোচ্য গল্পের কথোপকথনে সেই বার্তাই আমরা পাই—

> "মেশিন ভাল না মানুষ ভাল, মানুষ ভাল না মেশিন ভাল, মেশিন মানুষ, মানুষ মেশিন।মেশিন মেশিন মেশিন।"[৭]

কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই অতীতেকালের এবং কথক কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র নয়।এই গল্পে দেখি যন্ত্র-মানুষের অসম প্রতিযোগিতায় মানুষের পরাজয়। যন্ত্রানুভূতি ক্রমশ মানবানুভূতিকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে মানুষ হয়ে উঠছে যান্ত্রিক। গল্পকার এই বাস্তব সত্য যন্ত্রনির্ভর সময়টাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন তাঁর গল্পে।

স্বপ্নময়ের 'দীন-ইলাহি' গল্পটিতেও সময়ের ব্যবহার দৃষ্টান্তমূলক। এই গল্পের নামকরণের মধ্যে দিয়েই গল্পকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সম্রাট আকবরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবাহী দীন-ইলাহি নামক নতুন ধর্মমতের

কথা। এ গল্পের নরুল চরিত্রটির মধ্যে ধর্মীয় উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও গল্পে শেষপর্যন্ত বর্নিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমস্যার রূপটি –

> "কাবায় বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মারা গেছে, সাহাবুদ্দিন হাঁক দিল মুসলিমদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাতে হবে। আর এস এস চ্যাঁচাচ্ছে রাম জন্মভূমি আদায় করবই।"[৮]

এ গল্পের কাহিনীকাল কথনকালের পূর্বের ঘটনা এবং কথক কাহিনীতলের অন্তর্গত চরিত্র নয়। গল্পকার অতীত ও বর্তমান সময়ের সূক্ষ্ম ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন সম্রাট আকবর বহু পূর্বে সর্ব ধর্মের প্রতি যে উদার মনোভাবের প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন, আমরা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও সেই আদর্শকে গ্রহন করতে পারিনি। সময় ব্যবহারের সফল দৃষ্টান্ত স্বপ্নময়ের এই আখ্যানটি। সময়কে ব্যবহারের পাশাপাশি গল্পের চরিত্রায়ণেও স্বপ্নময় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এখন তাঁর আখ্যানের চরিত্রায়ণে আলোকপাত করা যাক।

চরিত্রায়ণ বলতে বোঝায় এই চরিত্রের বিশেষ ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের বিশেষ অংশের ওপর আলোকপাত করা। আখ্যানে চরিত্ররা মূলত গল্পের একটা গঠনগত রোল বা ভূমিকা মাত্র পালন করে। আখ্যানতাত্ত্বিকেরা চরিত্রের কোনো মনস্তত্বায়ন স্বীকার করেন না। একটি চরিত্র সম্পর্কে অন্য চরিত্রের স্পষ্ট ভাবনা বা মন্তব্যকে সাজিয়ে কিংবা কাহিনী কথনে চরিত্রের নিরীক্ষণকে ব্যবহার করে চরিত্রায়ণ করা হয়। নির্বাচিত গল্পগুলিতে স্বপ্নময় চরিত্র নির্মাণে কতটা সফল হয়েছেন তা দেখে নেওয়া যাক -

প্রথমেই আসাযাক 'লজ্জামুঠি' গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুচিত্রা। গঙ্গামনির কাঙ্ক্ষিত মেয়ে সুচিত্রা। মা গঙ্গামনির মন্তব্য – "আমার একটা মেয়ে আছে, বড়লক্ষী..."[৯]। মায়ের এই মন্তব্যে সুচিত্রা চরিত্রের সরাসরি একটি ভালো দিক ফুটে ওঠে। নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, নিজের সুখ ত্যাগ করে, তার পরিবার যাতে ভালো থাকে, ভালো খায়, দুই ভাই যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া চালাতে পারে- এই ভেবে অপরিচিত শহর কলকাতায় অফিসারনীর বাড়ি চলে যায় দাসীবৃত্তি করতে। সে যেমন নম্র, স্নেহময়ী তেমনই দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী। সে তার ব্যবহার ও কাজের দ্বারা সহজের বাড়ির কর্তা-গিন্নীর মন জয় করে নেয়। আসলে নিজের পরিবারের খেয়াল রাখতে পেরে শত পরিশ্রমেও তার মন সর্বদা আনন্দে থাকে। তবে তার এই আনন্দময় জীবনে অন্ধকার ডেকে আনে বর্তমানের যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। বাড়ির নিত্যনতুন মেশিনের সাথে প্রতিযোগীতায় নিজের পরাজয়কে সে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে বটে, কিন্তু যাদের জন্য সে আত্মত্যাগ করছে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, সেই মা-ভাইয়েরা যখন তাকে তিরস্কার করে, তখন সে অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করে। এই তীব্র জ্বালা গল্পের সমাপ্তিতে তার প্রতিবাদে পরিণত হয়। সুচিত্রার প্রতিবাদ প্রকাশ পায় এইভাবে-

> "লজ্জা মুঠি খুলে গেছে। মাটির গায়ে ফুটে উঠেছে চারটি নখের কঠিন আঁচড় চিহ্ন। আঁচড়ের সন্ত্রাস। মেয়েলি ভাষায় ঐ ক্ষোভ চিত্রলিপি মাটিতেই পড়ে রইল।"[১০]

স্বপ্নময় সুচিত্রা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন মাত্র। চরিত্রটির প্রতি লেখকের কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখা যায় না। আসলে সুচিত্রার মা, দুইভাই, কর্তা ও গিন্নীমা, এরাই সকলে সুচিত্রার কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গল্পে এসেছে। সুচিত্রা চরিত্রটি নিজেই বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে শান্ত থেকে ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বের এই উত্তরণের মধ্যে দিয়েই স্বপ্নময়ের স্বকীয় বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। আখ্যানের চরিত্রায়ণে এখানেই স্বপ্নময়ের সার্থকতা।

স্বপ্নময়ে 'দীন-ইলাহি' গল্পের চরিত্রায়ণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই গল্পে আখ্যানের ভিতর আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পের তিনটি প্রধান চরিত্র হল, জীবনপাত্র, নরুল ও স্বাতী। তবে কেন্দ্রিয় চরিত্র হল নরুল এবং জীবনপাত্র ও স্বাতী হল সহায়ক চরিত্র। নরুল ও স্বাতী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার মানসিকতা সম্পন্ন, তাই উভয়ই জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু স্বাতীর এই ধর্মীয় উদারতা কিছুটা মেকি। সে একজন

মুসলমানকে বিবাহ করতে পারে কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো কথার প্রতিবাদ করতে পারেনা। এমনকি মুসলমান পাড়ায় বাড়ি ভাঁড়া থাকতেও সে নারাজ। তার মনোভাব প্রকাশ পায় তার মন্তব্যে –

"ওই সব জায়গায় কীরকম মুসলমান – মুসলমান গন্ধ।"[১১]

কিন্তু নরুল প্রকৃত অর্থে একজন ধর্মীয় উদার মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। সে মুসলমান হওয়ায় অফিসে ও ক্যান্টিনে কটু ব্যবহার পেলেও সে ভাবে –

"এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মনখারাপ করলে চলেনা।"[১২]

মুসলমান ধর্মের খোৎবা, কবুল, দোয়া-দরুদ, ফরজ, ছোন্নত ইত্যাদি ধর্মীয় আচার মেনে চলা অত্যাবশ্যকীয় মনে না করলেও, নরুল সব ধর্মের আচার আচরনের প্রতি সহানুভূতিশীল। নরুল যেহেতু নিজেকে কোনো ধর্মীয় গন্ডীতে বাঁধেনি তাই বাড়ি ভাঁড়া পাওয়ার জন্য অনায়াসেই সে 'নারায়ণ মজুমদার' নাম গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সত্য সামনে আসতেই নরুল আহত হয়, তিরস্কৃত হয়। কারণ বর্তমানে মানুষ, মানুষকে গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে তার ধর্মীয় পরিচয়কে। এইভাবে নরুল চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে গল্পকার সমাজের প্রকৃত স্বরূপের সম্মুখীন করান আমাদের। সমাজের উপরিভাগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকলেও সমাজের অন্তরে যে আজও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রয়েছে, তা নরুলের চরিত্রায়ণের মধ্যে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সার্থক হয়েছেন স্বপ্নময়।

স্বপ্নময় তাঁর 'গিরিবালার গল্প' আখ্যানের কেন্দ্রিয় গিরিবালা চরিত্রটিকেও অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গিরিবালা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পত্নী এবং নিজেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে বর্তমানে গিরিবালা অবহেলিত লাঞ্ছিত, বোঝা-স্বরূপ, কেবল পরিবারের কাছেই নয়, সমাজের কাছেও। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য বরাদ্দ পেনশানটুকু প্রাপ্তি থেকেও সে বঞ্চিত হয়। এমনই অসহায় অবস্থা সমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। আমরা গিরিবালার পরিচয় পাই আখ্যানে বর্ণিত তাঁর স্বরচিত 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' কবিতার মধ্যে দিয়ে—

"বিপ্লবীর পত্নী আমি সাধারণ নারী
বড় ছেলে হাঁটে মোর, ছোট হামাগুড়ি
দোঁহে তারা পিতৃহীন, পিতা লোকান্তরে
দারিদ্র সর্পসম বাস করে ঘরে
তথাপি স্বপ্ন দেখি ফিরিতেছে দিন
আমার জন্মভূমি হয়েছে স্বাধীন"[১৩]।

দেশ ভাগের জন্য গিরিবালা নিজের স্বামী-পুত্রকে হারিয়েছেন। নিজে জেলও খেটেছেন। তার কাছে দেশভাগ এতটা কষ্ট করছিল বলেই সে বলে—

"সে তো অনেক কথা? তোমরা কও স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আর আমি কই দ্যাশভাগের পঞ্চাশ বচ্ছর।"[১৪]

দেশ ভাগের কথা স্মরণ করে নিজের মন দেহ 'জালালাবাদের পাথরের' মতো শক্ত হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে তাকে বলতে শুনি—

"আমার পেনশনের জন্য একটু চ্যাস্টাকর কইলজা আমার, বড় গঞ্জনা, বড় পরাধীন আমি, পরাধীন..."[১৫]

একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর কণ্ঠে 'আমি বড় পরাধীন'- এই উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কেবল যে তাদের অসহায় করুন জীবন অবস্থার কথাই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, এর মধ্যে দিয়ে বর্তমান সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্রটিও ফুটে উঠেছে। এইভাবে ঐতিহাসিক সময় ও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গিরিবালা চরিত্রটি যেভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে তুলেছে, তাতে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্তমান অবস্থার প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হয়েছে। এমন বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টিতে স্বপ্নময়ের কৃতিত্ব অতুলনীয়।

এখন আলোচনা করা যাক, আখ্যানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কথনরীতি সম্পর্কে। এই কথনরীতির ব্যবহারে স্বপ্নময় যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসণীয়। সুতরাং, এখন তাঁর আখ্যানের কথনরীতির ব্যবহার দেখে নেওয়া যাক-

আখ্যান মৌখিক বা লিখিত যাই হোক না কেন, আখ্যান মাত্রেই কথনতলে তিনটি উপাদান থাকবেই : কথক (উত্তমপুরুষ) - শ্রোতা (মধ্যমপুরুষ) – কথাবস্তু (প্রথমপুরুষ)। কথকমাত্রেই উত্তমপুরুষ বটে, কিন্তু কথন মাত্রেই আত্মকথন নয়। আসলে নিরীক্ষক কাহিনীতে কোন ভূমিকা পালন করছে তার ওপর নির্ভর করে আখ্যানের প্রেক্ষিত কী হবে এবং পরিণামে কথনরীতিই বা কী রকম হবে। আখ্যানে সাধারণত তিন ধরণের কথন পরিস্থিতি লক্ষ করা জায়। এক, আত্মকথন পরিস্থিতি – যেখানে নিরীক্ষক আখ্যানের ভূমিকা বা চরিত্র হয়; দুই, সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতি – যেখানে নিরীক্ষকের অবস্থান কাহিনীর বাইরে এবং তিন, ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতি – যখন নিরীক্ষক কোনো কাহিনীর মুখ্য বা গৌণ ভূমিকা অথচ সে কথক নয়, তখন তা ভূমিকানুগ কথনরীতি তৈরী করে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পে আমরা দেখতে পাই, কাহিনী কথকের ভূমিকায় তিনি সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতির প্রথম পুরুষের কথনরীতির ব্যবহার করেছেন বেশি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমার নির্বাচিত তিনটি গল্পকেই এই শ্রেণীভূক্ত করা যেতে পারে। যেমন 'লজ্জামুঠি' গল্পটি শুরুই হয়েছে সর্বজ্ঞকথনের প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে—

> "এক যে আছে মেয়ে, তার নাম হল গে সুচিত্রা।"[১৬]

তবে সর্বজ্ঞকথনের বহিঃপ্রেক্ষিত বহুক্ষেত্রেই একধরনের কৃত্রিমতার জন্ম দেয় কিন্তু স্বপ্নময় অত্যন্ত কুশলতার সাথে সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতির মধ্যে কখনও আত্মকথন, আবার কখনও সংলাপ বিনিময় রীতি ব্যবহার করে সর্বজ্ঞকথনে কথকের বিশ্বস্ততা বজায় রেখেছেন। স্বপ্নময়ের গল্পের এরূপ কথন পরিস্থিতি তাঁর গল্পের জগৎকে আধিক বাস্তবসম্মত করে তুলেছে।

একইরকম ভাবে 'দীন-ইলাহি' গল্পেও দেখি সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতির প্রয়োগ, যেমন—

> "জীবনবাবু নতুন একটা প্রোগ্রামের পরিকল্পনা করছিলেন। অনেক সিগারেট পুড়ছিল।"[১৭]

তবে কাহিনীতে তৃতীয় বন্ধনী প্রয়োগ করে পাঠক জীবনপাত্রের গল্পপাঠ কেন্দ্রিক আত্মকথন জুড়ে দিয়ে স্বপ্নময় একদিকে যেমন গল্প আঙ্গিকে নতুনত্ব এনেছেন অন্যদিকে তেমনই জীবনপাত্র চরিত্রটিকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছেন। গল্পে দেখি -

> "ওঃ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সারভেন্ট? তবে কোয়ার্টারের চেষ্টা করছেনা কেন? ... বেজাতে প্রেম করেছ, এসব খবর রাখো না?"[১৮]

এমনভাবেই সর্বজ্ঞকথন পরিস্থিতির মধ্যে আত্মকথনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে গল্পে বাস্তবমোহ উৎপন্ন করতে স্বপ্নময় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আমরা দেখি 'গিরিবালার গল্প' আখ্যানেরও সূচনা পর্বে এসেছে সর্বজ্ঞকথকের প্রথম পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি—

> "গিরিবালার চোখ একোন ভালো, গিরিবালা টিভির দিকে তাকিয়ে, বেশ বুঝতে পারছেন একটি মেয়ে জল থেকে উঠে এল, এবার মনে হয় নাচবে।"[১৯]

তবে গল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে গল্পে এসেছে গিরিবালার আত্মকথন –

> "ঈশ্বর ব্যাপকেরেই নেয়, আমারেই নেয় না।"[২০]

আমরা দেখি স্বপ্নময় কথন পরিস্থিতির সুচারু ব্যবহারে তিনটি গল্পেই বাস্তব জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই অনায়াসেই বলা যায় স্বপ্নময় চক্রবর্তী হলেন আখ্যানের কথন পরিস্থিতি সৃজনের একজন দক্ষ কারিগর।

এবার দেখে নেওয়া যাক স্বপ্নময় তাঁর ছোটগল্পে আখ্যানের অন্যতম উপাদান 'মুক্ত পরোক্ষ বাচন' ব্যবহারে কতটা সার্থকতা পেয়েছেন। ভূমিকাতেই আমরা উল্লেখ করেছিলাম আখ্যানতাত্ত্বিকগণ বাচনের দুটি রূপের কথা বলেছেন। একটি, পরোক্ষ বাচন বা কথন, আরেকটি প্রত্যক্ষ বাচন বা সংলাপ। সুতরাং, আখ্যানের মুক্ত পরোক্ষ বাচন হল – কথনের আধারে সংলাপের উপাদান প্রয়োগ। এক্ষেত্রে মুক্ত পরোক্ষ বাচন মূলত ভূমিকা বা চরিত্রানুগ কথন পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল কাহিনীতলে কোনো ভূমিকা বা চরিত্রের ফোকালাইজেশন। মুক্ত পরোক্ষ বাচন বা Free Indirect Discourse-এ কাহিনীর প্রথম পুরুষ বাচনে উত্তম পুরুষ হিসেবে এবং অব্যবহিত স্থান-কালগত প্রসঙ্গ (যেমন, এখন, এখানে, এই, আজ ইত্যাদি) মুক্ত পরোক্ষ বাচনে অপরিবর্তিত ভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, আমার নির্বাচিত স্বপ্নময়ের ছোটগল্প তিনটিতে ভূমিকানুগ কথন পরিস্থিতিতে এই মুক্ত পরোক্ষ বাচন কীভাবে ও কতটা ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা প্রাসঙ্গি কহয়েছে কী না দেখে নেওয়া যাক।

প্রথমেই স্বপ্নময়ের 'গিরিবালার গল্প' আখ্যানটিতে আলোকপাত করে দেখি –

> "রাত হয়েছে বেশি। অনির্বানের আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। আজ আর হ'ল না, একটু দূরে মহুয়ার মা। হাতছানিতে ডাকল অনির্বানকে। হাতছানিতে ব্যস্ততা, কাতরতাও। মহুয়ার মা বলল – ঐ যে ছবিটা গান্ধীজীর সঙ্গে, ছবিটি দেবেন?"[২১]

অর্থাৎ এখানে কথনের মধ্যে চরিত্রের সংলাপ বিগর্ভিত হচ্ছে এবং অব্যবাহিত স্থান-কালগত প্রসঙ্গ যেমন 'আজ' অপরিবর্তিতভাবে থেকে গেছে। একইরকমভাবে 'লজ্জামুঠি' গল্পেও দেখি মুক্ত পরোক্ষ বাচনের যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে। যেমন—

> "গঙ্গামণির চোখে জল এল। বলল, ... ম্যাস্টার তোদের কত ভালোবাসে, তোরা পড়। ম্যাট্রি-পাশ দে... রোজগার আমিই দেখব, ঠোঙ্গা বেচব।"[২২]

এখানেও দেখা যাচ্ছে সর্বজ্ঞকথনে অন্তঃপ্রেক্ষিতের জন্ম হয়েছে। এই মুক্ত পরোক্ষ বাচনের প্রয়োগ এক হিসেবে সর্বজ্ঞ কথকের অসম্ভবপ্রায় সর্বত্রগামিতা থেকে আখ্যানকে মুক্ত করে। ফলে আখ্যান পাঠকের কাছে অধিক সমাদৃত হয়।
স্বপ্নময়ের 'দীন-ইলাহি' গল্পেও লক্ষ করা যায়, আখ্যানের প্রথম পুরুষ বাচনে উত্তম পুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, যা মুক্ত পরোক্ষ বাচনের প্রধান শর্ত। গল্পে দেখি –

> "জীবনপাত্র রেডিয়োতে চাকরি করেন।গতকাল মোমো খেয়েছেন। এখন সিগারে টখাচ্ছেন। টেনশনে খান।"[২৩]

এই গল্পেও স্পষ্ট লক্ষ করা যায় যে কথনের মধ্যে চরিত্রের সংলাপ বিগর্ভিত হয়ে যাচ্ছে এবং কালগত প্রসঙ্গ যেমন 'এখন' আপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকটি গল্পে মুক্ত পরোক্ষ বাচন প্রয়োগে স্বপ্নময় যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তা যেমন একটি একঘেয়ে একক স্বরের অভ্যাস থেকে আখ্যানকে মুক্ত করেছে তেমনই আখ্যানের মধ্যে এক অপূর্ব বাস্তবের অভিঘাত তৈরি করেছে যা পাঠকহৃদয়কে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

সবশেষে আসা যাক আখ্যানের মূল আকর্ষণ সংস্থানের আলছনায়। সংস্থান বা setting হল কোনো গল্প বা উপন্যাসের আবহ। এই আবহই মূলত একটি গল্প বা উপন্যাসের স্থান-কাল-ঘটনা ও চরিত্রের স্থিতি বা অবস্থা সম্পর্কে আমদের পরিচয় প্রদান করে। তাই আবহের সঠিক রূপায়ণের মাধ্যমেই যেমন একটি গল্প বা উপন্যাস পাঠকের কাছে বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়, তেমনই একজন লেখকেরও লেখনি দক্ষতা প্রকাশ পায় আবহের যথাযথ নির্মাণের মাধ্যমে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে সংস্থান বা আবহ লেখক ও তাঁর লেখাকে সার্থকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দান করে। তাই যেকোনো আখ্যানের ক্ষেত্রেই সংস্থানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ছোটগল্পের আবহ নির্মাণের মাধ্যমে পাঠকের কাছে গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে পেরেছেন কিনা তা দেখে নেওয়া যাক—
আমার নির্বাচিত তিনটি ছোটগল্পের মধ্যে প্রথমেই আলোচনা করা যাক 'লজ্জামুঠি' ছোটগল্পটির। এই ছোটগল্পটিতে মানুষের যন্ত্রনির্ভরতা এবং মানুষের ওপর বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার নিষ্ঠুর প্রভাব—এই ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে গল্পের আবহ

নির্মাণ করতে চেয়েছেন স্বপ্নময়। এই আবহ নির্মাণের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন সুচিত্রা চরিত্রটির। এই সুচিত্রা হল গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি অশোকনগর নামক গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে অনাকাঙ্ক্ষিতের মধ্যে দিয়ে জন্ম হয় সুচিত্রার। পুরুষশাসিত যুগ অনুযায়ী, সুচিত্রার দুই ভাই পায় ভালো ভালো খাওয়া-পড়া আর সুচিত্রা পায় অবহেলা। এই সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশেই বড়ো হয়ে ওঠে সুচিত্রা। পরিবার পালনের দায়িত্ব নিয়ে সে চলে যায় কলকাতা শহরে। দাসীবৃত্তি করার কাজে নিয়োজিত হয়। গ্রাম থেকে চাকচিক্যময় কলকাতা শহরে শুরু হয় তার নতুন জীবন। এইভাবেই তৎকালীন সমাজ এবং গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী করে শান্ত-নম্র-কর্তব্যপরায়ণ স্বার্থত্যাগী সুচিত্রা চরিত্রটির বুনন করেছেন স্বপ্নময়। এরপর ঘটনা যত অগ্রসর হয় আমরা লক্ষ করি শহর জীবনে গিয়েও নিজের কাজ ও সুব্যবহারের দ্বারা সুচিত্রা সহজেই কর্তা-গিন্নীর মন জয় করে নেয়। কিন্তু বাড়িতে আগত একের পর এক মেশিনের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় সুচিত্রা। কর্তা-গিন্নীর মুখে মেশিনের প্রশংসা শুনে খানিক ঈর্ষাও অনুভব করে সে। শেষে মেশিনের জন্যই নিজের মা-ভাই, কর্তা-গিন্নী, প্রেমিক রতন – প্রায় সকলের কাছ থেকেই অপমানিত ও তিরস্কৃত হতে হয় সুচিত্রাকে। এইভাবে জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটে যায় সুচিত্রার জীবনের বিবর্তন। গল্পে স্বপ্নময় সুচিত্রার এই বিবর্তনকে চিত্রিত করেছেন এইভাবে—

> "সুচিত্রার নিচু মুখটা, ভারি মুখটা, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে জেগে ওঠে, যেন জলের অতল থেকে মাথা তুলল মনসা-বাহন। অকাল সোজা। নির্বাক। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কত কী বলে। কোঁচকায় কপাল, আর গোটা নারী জন্মটাকে জ্বলন্ত অঙ্গার করে ছুঁড়ে মারে চোখের দৃষ্টিতে। থপ্ থপ্ পায়ে ঘর থেকে বার হয়, মেদিনী কেঁপে ওঠে, স্বর্গসভায় বেহুলার, পদ-নূপুরের আর্ত-নিক্কণ চরাচরে বাজে।"[২৪]

স্বপ্নময় সুচিত্রা চরিত্রটির সৃষ্টি করলেও, সুচিত্রা চরিত্রটিকে চালনা করেননি। সুচিত্রা নিজেই জীবনের জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিপদক্ষেপেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হয়ে উঠেছে কঠোর ও প্রতিবাদী। বর্তমানের যন্ত্রযুগে সুচিত্রার এই উত্তরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবিক। তাই 'লজ্জামুঠি' গল্পটি আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং, বলাবাহুল্য এই গল্পের সংস্থান নির্মাণে স্বপ্নময় সফলতা অর্জন করেছেন।

একই রকম ভাবে স্বপ্নময়ের 'গিরিবালার গল্প' ছোটগল্পটি পাঠকের কাছে কতটা বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই গল্পটিতে স্বপ্নময় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিণতি কী, তারা কী অবস্থায় আছে – তাকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন গল্পের সুসামঞ্জস্য আবহ নির্মাণের মাধ্যমে। গল্পের গিরিবালা চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই গল্পের আবহ নির্মাণ করেছেন লেখক। গল্প বুননের সূচনাতেই স্বপ্নময় দেখিয়েছেন বৃদ্ধ গিরিবালার প্রতি পরিবারের অপ্রীতিকর ব্যবহার এবং গিরিবালার থাকার জন্য এক অস্বাস্থ্যকর ঘর। এই চিত্র স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়। ঘটনাক্রমে আমরা দেখি এই গিরিবালা হলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কাগজে একটা কভার স্টোরি করার উদ্দেশ্যে খোঁজ পরে গিরিবালার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। নতুবা এই সমাজ প্রায় ভুলেই যায় তাদের কথা। এটাই চরম বাস্তব। এই গল্পেও দেখি পরিবারের গরজ শুধুমাত্র গিরিবালার পেনশনের টাকা প্রাপ্তিটুকু নিয়েই। এটা ব্যতীত গিরিবালা কেবলমাত্র পরিবারের বোঝা, অবহেলার পাত্র। স্বপ্নময় গিরিবালার জীবনের এই করুণ চিত্রের পাশাপাশি একটি চিঠির মাধ্যমে ফ্ল্যাশব্যাক পন্থা অবলম্বন করে দেখিয়েছেন পঞ্চাশ বছর পূর্বে তার সংগ্রাম ও তার প্রতাপকে। আত্মকথন রীতি ব্যবহারের মাধ্যমে গিরিবালা চরিত্রটি অনেকবেশি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। গল্পে গিরিবালার মুখেই শুনি পঞ্চাশ বছর পূর্বে তার সংগ্রামের কথা আবার এই গিরিবালার মুখেই শুনি বর্তমানের লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে মুক্তি পাওয়ার করুণ আকুতি। স্বপ্নময় গিরিবালার বর্তমান অবস্থাকে চিত্রিত করেছেন এই ভাবে—

> "গিরিবালা তখন দু'হাতে ঐ বইটিকে নেয়, যেন তুলে নিল আইন অমান্যের নুন। অনির্বাণের কাঁধটা খামচে ধরে, যেন খামচে ধরেছে জালালাবাদের পাথর। কানের কাছে মুখ নিয়ে যায় তারপর যেন গুপ্তমন্ত্র বলছে

> কোন। বলে—আমার পেনশনের জন্য একটু চ্যাষ্টা কর কইলজা আমার, বড় গঞ্জনা, বড় পরাধীন আমি, পরাধীন...”[২৫]

গল্পের এই ঘটনাক্রমের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেদনাদায়ক অবস্থা যেমন সহজেই অনুমান করা যায় তেমনই সহজেই প্রকাশ পায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সমাজের স্বার্থান্বেষী মনোভাব। গিরিবালার ছেলে স্বদেশরঞ্জন, বৌমা, নাতনি মহুয়া এবং অনির্বাণ – এরা প্রত্যেকেই সমাজের স্বার্থান্বেষী মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রতিভূ। এইভাবে বাস্তবের সাথে সঙ্গতি রেখে আবহ বিন্যাসের মাধ্যমে স্বপ্নময় যেভাবে গল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাতে গল্পটি যেমন পাঠকের মনে বাস্তবমোহ উৎপন্ন করেছে তেমনই গল্পটি বিশাসযোগ্যও হয়ে উঠেছে। এইরূপ আবহবিন্যাসে যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন গল্পকার স্বপ্নময়, তা প্রশংসনীয় এবং অভিনব।

স্বপ্নময়ের এই সংস্থান নির্মাণের মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘দীন-ইলাহি’ নামক ছোটগল্পের মধ্যেও। বর্তমান সমাজের উপরিতলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকলেও সমাজের অভ্যন্তরে এখনও যে চিরাচরিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাবই থেকে গেছে – এই সত্যকেই ‘দীন-ইলাহি’ গল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের সামনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন স্বপ্নময়। এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরতে কীভাবে তিনি গল্পের আবহকে নির্মাণ করেছেন, সেটা দেখে নেওয়া প্রয়োজন – প্রথমেই স্বপ্নময়ের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় গল্পের নাম নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। ‘দীন-ইলাহি’ হল সম্রাট আকবরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কর্তাবাহী এক নতুন ধর্মমত। গল্পের এই নামকরণের মধ্যে দিয়েই গল্পের ভিতরের আবহটি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করতে পারি আমরা। তারপরে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করেই দেখি গল্পের চরিত্র জীবনপাত্রকে। তিনি রেডিয়োতে চাকরী করেন। কমিউনাল হারমনির উপর তার একটা রেডিয়ো প্রোগ্রামের পরিকল্পনা থেকে সূচনা হয় গল্পের মধ্যেকার দ্বিতীয় গল্পের। এই গল্পের চরিত্র নরুল ও স্বাতী। এই নরুল ও স্বাতী জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্বন্বয়ের দৃষ্টান্ত বহন করেছে ঠিকই, কিন্তু গল্পে লক্ষ করি সমাজ মেনে নেয় না এই বিবাহবন্ধনকে। গল্পের ঘটনাক্রমে দেখি দাম্পত্যজীবন শুরু করতে একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার জন্য মুসলমান নরুলকে ‘নারায়ণ মজুমদার’ এই হিন্দু নাম ধারণ করতে হয়। নরুল স্বাচ্ছন্দ্যে এই হিন্দু নাম গ্রহণ করে নিলেও, তার আসল নাম জানাজানি হতেই সে তিরস্কৃত হয়, মুখোমুখি হয় অপমানের কিংবা বলা যায় সম্মুখীন হয় সমাজের চরমসত্যের। গল্প পাঠক জীবন পাত্রের কাজ রেডিয়োর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা সম্প্রসারণ করা হলেও গল্পের এই নরুল ও স্বাতীর বিবাহ সম্পর্কে তার মনোভাব প্রকাশ পায় তার আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে—

> “হিন্দু মেয়েটাকে নিয়ে মুসলমান ছেলেটা থাকবে নাকি? ঘর চায় কেন? বিয়েও করেছে নাকি? – বাঙালি ঘরের মেয়েগুলো যা হচ্ছে না আজকাল!”[২৬]

আসলে এই মনোভাব একা জীবন পাত্রের নয়, বর্তমানের গোটা সমাজেরই। জীবনপাত্র এই মেকি উদার মনোভাবাপন্ন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে মাত্র। আর তাই সমাজের নরুল ও স্বাতীর মতো মানুষদের ইচ্ছে থাকলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারে না। আমরা চারপাশে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেরই নজির দেখি। সুতরাং, বলা যায় স্বপ্নময় গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ থেকে শুরু করে গল্পের প্রতিটি ঘটনা-স্থান-কাল-চরিত্রের সম্বন্বয়ে গল্পের আবহকে এমন বাস্তবমুখী করে তুলেছেন যে, গল্পটি পাঠকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পের পরতে পরতে আমরা সম্মুখীন হই কঠিন বাস্তবের। তাই বলাবাহুল্য, গল্পের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে গল্পের আবহ নির্মাণ করতে স্বপ্নময়ের কৃতিত্ব অনন্য-সাধারণ।

আসলে গত সাড়ে তিন দশক ধরে স্বপ্নময় চক্রবর্তী যেভাবে নিজেকেই বিনির্মাণ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত কথন বিশ্বনির্মাণের নতুন নতুন প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তা অভূতপূর্ব এবং সম্ভবত এইজন্যেই নিজস্বপথে তিনি একক যাত্রী। আখ্যানতাত্ত্বিকদের তত্ত্বানুযায়ী আখ্যান হল যুগপৎ কাহিনীর নির্মাণ ও বিনির্মাণ, ঘটনা বিন্যাসের ক্রম অক্ষুণ্ন রাখা আবার সেই ক্রমের রৈখিকতা ভেঙে দেওয়াও। স্বপ্নময়ও ক্রমশ ছোটগল্পের কাহিনী নির্ভরতা, যান্ত্রিক রৈখিকতা বাখ্যা মনস্কতা ও পূর্ব নির্দিষ্ট নিরীক্ষণের অনুকূলে গ্রন্থনা তৈরির প্রবণতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে আখ্যান

অভিমুখে সরে এসেছেন। তিনি আখ্যান উপাদানগুলির নিহিত চালিকাশক্তি হিসেবে নিরীক্ষণ বা ফোকালাইজেশনকে ব্যবহার করেছেন। স্বপ্নময় গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন অনেক। গল্পের মধ্যে খোঁজ করেছেন জীবনের নতুন নতুন প্রবেশ বিন্দু ও নির্গমবিন্দু। গল্পের বক্তব্য প্রকাশে চরিত্রায়ন, ফ্ল্যাশব্যাক রীতির ব্যবহার, আত্মকথন, সর্বজ্ঞকথন, উপযুক্ত প্রেক্ষিতের প্রয়োগে তিনি গল্পের প্রকরণে এনেছেন অভিনবত্ব। তাই বলা যায়, আপন স্বভাবসিদ্ধ শৈল্পিক দক্ষতাতে আখ্যান বিশ্বনির্মাণেও অভিনবত্ব প্রকাশে সমকালের কথা শিল্পীদের সঙ্গী হয়েও নিজস্বতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫৩
২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, সেরা ৫০টি গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০১১, ভূমিকাংশ
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পঞ্চভূত, কলকাতা : বিশ্বভারতী, বঙ্গাব্দ, ১৩০৪, পৃ. ৬৫
৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৮৪
৫. তদেব, পৃ ১৮৯
৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, সতর্কতামূলক রূপকথা, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ১৯৯৭, ভূমিকাংশ
৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৬০
৮. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৬, পৃ ২৩৬
৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৫৪
১০. তদেব, পৃ. ১৬২
১১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৬, পৃ. ২৩৫
১২. তদেব, পৃ. ২৩২
১৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৮৫
১৪. তদেব, পৃ ১৮৮
১৫. তদেব, পৃ ১৮৮
১৬. তদেব, পৃ ১৫৩
১৭. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৬, পৃ. ২৩১
১৮. তদেব, পৃ ২৩২
১৯. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৮২
২০. তদেব, পৃ ১৮৩
২১. তদেব, পৃ ১৮৮
২২. তদেব, পৃ ১৫৪
২৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, পঞ্চাশটি গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৬, পৃ. ২৩১
২৪. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১৬১
২৫. তদেব, পৃ. ১৮৭
২৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, পঞ্চাশচটি গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৬, পৃ. ২৩২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অমিতাভ, দাস, আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা : দে'জ, ২০১৯